



Original Research

বাংলাদেশে অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল: নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ও বৈধতা নির্মাণের প্রক্রিয়া

ড. মোঃ আল-আমীন হুসাইন^১, জাহিদ হাসান শেখ^২

^১রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪৪ ।

* Corresponding Author: ড. মোঃ আল-আমীন হুসাইন; Mobile: +8801823820480; E-mail: alamin38gp@gmail.com

Received: 20/07/2026; Accepted: 10/10/2026; Online Available: 22/10/2026.

সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন জনগণের রাজনৈতিক পছন্দের প্রতিফলন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলেও অনেক রাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা বজায় রেখে এর বাস্তব পরিসর সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন একদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, অন্যদিকে রাজনৈতিক বৈধতা নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বিদ্যমান গবেষণায় বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা, অংশগ্রহণ সংকট, প্রশাসনিক প্রভাব ও নির্বাচনী অনিয়ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও এসব ঘটনাকে একটি পরিবর্তনশীল নির্বাচনী প্রকৌশল প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কম। এই গবেষণা বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ও বৈধতা নির্মাণ এর আলোকে বিশ্লেষণ করে নির্বাচনী প্রকৌশলের পরিবর্তনশীল রূপ অনুসন্ধান করেছে। গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে নথি বিশ্লেষণ, নির্বাচনী প্রতিবেদন ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে উদ্দেশ্যমূলক ও তত্ত্বনির্দেশিত ঘটনা নির্বাচনের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলাফল দেখায় যে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইনগত পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ, তথ্যগত প্রভাব এবং চাপ প্রয়োগমূলক কৌশল পরস্পর সংযুক্তভাবে কাজ করতে পারে। তবে এসব কৌশল সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রতিযোগিতা সংকোচন, ২০১৮ সালে নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা, ২০২৪ সালে নিয়ন্ত্রিত বহুত্ববাদ এবং ২০২৬ সালে অধিক বহুমুখী প্রতিযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রকৌশলের ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস দেখা যায়। এই ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে এই গবেষণায় ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণাটি প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মূল বক্তব্য হলো, নির্বাচনী প্রকৌশল কোনো স্থির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল নয়, বরং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রতিযোগিতামূলক চাপ, প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস এবং বৈধতার প্রয়োজনের সঙ্গে এর কৌশল ও রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন নির্বাচনী অনিয়মের পরিবর্তে প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও বৈধতা নির্মাণের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা অধিক কার্যকর। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতি বোঝার জন্য একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক বিশ্লেষণী কাঠামো প্রদান করে।

মূল-শব্দ: নির্বাচনী প্রকৌশল, অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল, নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা, বৈধতা নির্মাণ, প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ, হাইব্রিড শাসন, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ;

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনকে সাধারণত জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে নাগরিকরা ভোটের মাধ্যমে শাসক নির্বাচন করে এবং সরকারকে জবাবদিহির আওতায় রাখে (Dahl, 1971)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন শুধু একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়, এটি গণতন্ত্রের বৈধতা নিশ্চিত করার একটি মৌলিক উপাদান। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রাষ্ট্রে নির্বাচন তার প্রচলিত গণতান্ত্রিক চরিত্র থেকে সরে গিয়ে এমন এক নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, যেখানে প্রতিযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে বজায় থাকলেও বাস্তবে তা সীমিত ও কাঠামোগতভাবে প্রভাবিত হয় (Levitsky & Way, 2010)। এই প্রেক্ষাপটে ‘নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণাটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এর মাধ্যমে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়, যেখানে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, তথ্যগত এবং বলপ্রয়োগমূলক কৌশল ব্যবহার করে নির্বাচনের কাঠামো ও ফলাফলকে প্রভাবিত করে (Schedler, 2002)। এ ধরনের ব্যবস্থায় নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হয়ে তা ‘নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা’ হিসেবে টিকে থাকে এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বৈধতা নির্মাণের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে (Gandhi & Lust-Okar, 2009)।

প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ তত্ত্ব এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কিছু রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যমান থাকলেও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সেগুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে (Levitsky & Way, 2010)। ফলে

নির্বাচন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হিসেবে বজায় থাকলেও বাস্তব ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনে এর কার্যকারিতা সীমিত হতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ধারণাগুলো বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতার পর থেকে দেশটি সামরিক শাসন, গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং দলীয় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তবে গত এক দশকে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন-বিশেষত ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের নির্বাচন-নির্বাচনী প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এসব নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন এবং প্রশাসনিক প্রভাবের অভিযোগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

নির্বাচন ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে প্রাথমিক রাজনৈতিক তত্ত্বে নির্বাচনকে জনগণের পছন্দ প্রকাশ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং শাসকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। Dahl (1971) এর বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতা গণতান্ত্রিক শাসনের মৌলিক উপাদান। কিন্তু পরবর্তী গবেষণা দেখিয়েছে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে না। বিশেষত কর্তৃত্ববাদী ও হাইব্রিড শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একই সঙ্গে ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং বৈধতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (Schedler, 2002, 2006; Gandhi & Lust-Okar, 2009)। এই গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো নির্বাচনকে কেবল ভোটগ্রহণের দিন বা ফলাফল দিয়ে মূল্যায়ন না করে নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। Schedler (2002) দেখিয়েছেন যে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা নির্বাচনকে সম্পূর্ণ বাতিল না করে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একইভাবে Levitsky and Way (2010) দেখিয়েছেন যে প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যমান থাকলেও ক্ষমতাসীন পক্ষ রাষ্ট্রীয় সম্পদ, প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক সুবিধার অসম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে নির্বাচন এখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিশ্চিত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হতে পারে। অন্যদিকে, Gandhi and Lust-Okar (2009) কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনের একটি দ্বৈত ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নির্বাচন একদিকে বিরোধী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ, বিভক্ত বা সীমিত করার সুযোগ তৈরি করে অন্যদিকে ক্ষমতাসীন শাসনের জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বৈধতার একটি প্রতীকী উৎস তৈরি করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচনকে কেবল নির্বাচনী কারসাজির ফল হিসেবে না দেখে শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের একটি প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান হিসেবে বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি করে।

নির্বাচনের মান ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিয়েও একটি পৃথক গবেষণাক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। Elklit and Reynolds (2005) এবং Hartlyn, McCoy, and Mustillo (2008) নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রশাসন, প্রতিযোগিতার পরিবেশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। এই গবেষণাগুলো নির্দেশ করে যে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করেছে এবং প্রতিযোগিতার জন্য সমান সুযোগ কতটা বিদ্যমান-তাও নির্বাচনের প্রকৃতি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান গবেষণায় নির্বাচন, দলীয় প্রতিযোগিতা, নির্বাচনী সহিংসতা, প্রশাসনিক পক্ষপাত এবং নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে বিস্তার আলোচনা রয়েছে (Ahmed, 2004; Huq, 2012; Riaz, 2016, 2020, 2022)। তবে এসব গবেষণার একটি বড় অংশ নির্দিষ্ট নির্বাচন, রাজনৈতিক সংকট অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যার ওপর কেন্দ্রীভূত। Riaz (2016) নির্বাচনী সহিংসতা, অংশগ্রহণ সংকট এবং রাজনৈতিক সংঘাতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। Ali (2018) নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিশ্লেষণ করেছেন। Huq (2012) তাঁর গবেষণায় গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ নিয়ে আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এসব গবেষণার একটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা হলো, এগুলো সাধারণত নির্বাচনী অনিয়ম বা সংকটকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করে, একটি সমন্বিত কাঠামোগত প্রক্রিয়া হিসেবে নয়। ফলে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের নির্বাচনকে একই বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর অধীনে রেখে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ধরন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে বৈধতা নির্মাণের কৌশল কীভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে এই প্রশ্নটি তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত।

বর্তমান গবেষণায় নির্বাচনকে বিচ্ছিন্ন অনিয়ম, সহিংসতা বা প্রশাসনিক পক্ষপাতের সমষ্টি হিসেবে না দেখে একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত, প্রতিযোগিতা কখন বাদ পড়ে, কখন নিয়ন্ত্রিত হয়, কখন বিকল্প প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দৃশ্যমান রাখা হয় এবং কখন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ভাষার মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়, এই ধারাবাহিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার জন্য গবেষণাটি ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণাটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

উপরের সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, নির্বাচন ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক গবেষণা রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও নির্বাচনী সহিংসতা, প্রশাসনিক পক্ষপাত, বিরোধী দলের অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে। তবে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের নির্বাচনকে একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক রূপান্তরের অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করে প্রতিযোগিতার ধরন ও বৈধতা নির্মাণের কৌশলের পরিবর্তনকে একই বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সীমিত। বর্তমান গবেষণায় এই ঘাটতি পূরণের জন্য নির্বাচনী প্রকৌশলকে একটি বহুমাত্রিক ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে এবং ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রকৌশল বিশ্লেষণের জন্য গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত নথি বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক কেস স্টাডির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। গবেষণার তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচনী ফলাফল ও সরকারি নথি, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য, নির্বাচন-সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন, সংবাদ প্রতিবেদন এবং নির্বাচনী রাজনীতি বিষয়ে প্রকাশিত একাডেমিক গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার কেস হিসেবে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা হয়েছে। এই চারটি নির্বাচন একই ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করে না, এগুলো বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রতিযোগিতার চারটি ভিন্ন পর্যায়কে নির্দেশ করে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য চারটি প্রধান বিশ্লেষণাত্মক মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে: (ক) রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিসর, (খ) নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা, (গ) অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতার বাস্তব সুযোগ, এবং (ঘ) বৈধতা নির্মাণের প্রধান রাজনৈতিক ভাষা ও কৌশল।

কেস নির্বাচনের যৌক্তিকতা

কেস নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক ও তত্ত্বনির্দেশিত অর্থাৎ কেসগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে গবেষণার কেন্দ্রীয় ধারণা ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’-এর বিভিন্ন empirical manifestation তুলনা করা যায়। এই গবেষণায় ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে উদ্দেশ্যমূলক কেস নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। কেসগুলো বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে নির্বাচিত হয়নি, এখানে গবেষণার মূল কাঠামোগত প্রশ্ন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ও নির্বাচনী প্রকৌশলের কৌশল কীভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে-এই উত্তর দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। চারটি নির্বাচন প্রতিযোগিতার চারটি স্বতন্ত্র বিন্যাস উপস্থাপন করে। ২০১৪ সালে প্রধান বিরোধী শক্তির বর্জনের ফলে প্রতিযোগিতার সংকোচন, ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ সত্ত্বেও অসম প্রতিযোগিতার অভিযোগ, ২০২৪ সালে প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতির মধ্যেও বিকল্প প্রতিযোগিতার দৃশ্যমানতা এবং ২০২৬ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তুলনামূলকভাবে বহুমুখী প্রতিযোগিতার পুনর্গঠন। এই বৈচিত্র্য একই বিশ্লেষণী কাঠামোর অধীনে নির্বাচনী প্রকৌশলের পরিবর্তনশীল রূপ পর্যবেক্ষণের সুযোগ তৈরি করে। ২০২৬ সালের নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ কারণ হলো, এটি পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনের তুলনায় ভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে, ফলে নির্বাচনী প্রকৌশল রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কীভাবে নিজে থেকে পুনর্গঠন করতে পারে তা পর্যবেক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলো-বিশেষত ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮-বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেগুলো এই গবেষণার প্রাথমিক কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ গবেষণাটি বাংলাদেশের পুরো নির্বাচনী ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করতে চায় না। বরং ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর নির্বাচনী প্রতিযোগিতা কীভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেই প্রকৌশল

কীভাবে অভিযোজিত হয়েছে, এই নির্দিষ্ট সময়পর্বকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে। এই কারণে ২০১৪-২০২৬ সময়পর্বটি গবেষণার জন্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে তিনটি প্রধান ধারণাগত স্তরের উপর। যথা: প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ, বৈধতা নির্মাণ এবং নির্বাচনী প্রকৌশল। এই তিনটি ধারণা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তারা এই গবেষণায় একটি আন্তঃসম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো গঠন করে। প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ ব্যাখ্যা করে কীভাবে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অসম হয়ে উঠতে পারে, বৈধতা নির্মাণ ব্যাখ্যা করে কীভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন পক্ষ তার শাসন ও নির্বাচনী ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, আর নির্বাচনী প্রকৌশল ব্যাখ্যা করে কোন আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, তথ্যগত ও রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার কাঠামো ও নির্বাচনী পরিবেশকে প্রভাবিত করা হয়। ফলে এই গবেষণায় প্রথম ধারণাটি শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয়টি বৈধতা উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং তৃতীয়টি নির্বাচনী প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে।

প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ: Levitsky এবং Way (2010) প্রদত্ত ‘Competitive Authoritarianism’ ধারণা অনুযায়ী, এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন নির্বাচন, সংসদ, আদালত) আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সেগুলোর ওপর অসম প্রভাব বিস্তার করে। ফলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হলেও তা কাঠামোগতভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচন একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা না হয়ে বরং একটি ‘অসম খেলার মাঠে’ পরিণত হয়, যেখানে ক্ষমতাসীন পক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা সুস্পষ্ট থাকে।

বৈধতা নির্মাণ: Gandhi এবং Lust-Okar (2009) দেখিয়েছেন যে কর্তৃত্ববাদী ও হাইব্রিড শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি মাধ্যম এবং এই শাসনব্যবস্থার বৈধতা অর্জনের একটি কৌশল। এই গবেষণায় ‘বৈধতা নির্মাণ’ বলতে বোঝানো হয়েছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে, যদিও প্রতিযোগিতার প্রকৃত মাত্রা সীমিত থাকে। এখানে বৈধতা বলতে কেবল নির্বাচনের আইনগত বৈধতা বোঝানো হচ্ছে না। এই গবেষণায় বৈধতা একটি রাজনৈতিকভাবে নির্মিত ধারণা, যার মধ্যে নির্বাচনের সাংবিধানিক গ্রহণযোগ্যতা, জনগণের অংশগ্রহণের দাবি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বয়ান এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা-সবই অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচনী প্রকৌশল: বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য বিচ্ছিন্ন অনিয়ম, সহিংসতা বা প্রশাসনিক পক্ষপাতের পৃথক বর্ণনা যথেষ্ট নয়। এগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করতে হয়, যেখানে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য বহুস্তরীয় কৌশল একযোগে প্রয়োগ করা হয়। এই সমন্বিত প্রক্রিয়াকেই এখানে ‘নির্বাচনী প্রকৌশল’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রকৌশল হলো মূলত আইনগত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ, তথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং বলপ্রয়োগমূলক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক প্রযুক্তি। এর লক্ষ্য সরাসরি ভোট গণনা পরিবর্তন করার পাশাপাশি এমন একটি নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে প্রতিযোগিতার ফলাফল কাঠামোগতভাবে পূর্বনির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় (Schedler, 2002)। এই কারণে নির্বাচনী প্রকৌশলকে নির্বাচনী কারচুপি বা অনিয়মের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল

উপরোক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে এই গবেষণায় ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণাটি প্রস্তাব করা হয়েছে। এর দ্বারা এমন একটি ধারাবাহিক নির্বাচনী রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে, যেখানে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা পরিচালনার কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং বৈধতা নির্মাণের ভাষা পুনর্গঠিত হয়। এখানে ‘অভিযোজন’ বলতে কেবল কৌশলের পরিবর্তন বোঝানো হয়নি না, বরং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিসর, অংশগ্রহণের ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচনের বৈধতা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির পরিবর্তনকে বোঝানো হয়েছে। এই ধারণাটি প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদ বা নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদের বিকল্প কোনো শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাস নয়। বরং এটি একটি প্রক্রিয়াভিত্তিক বিশ্লেষণী ধারণা। এর উদ্দেশ্য হলো একই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সময়ের সঙ্গে নির্বাচনী প্রকৌশলের ধরন কেন

এবং কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা ব্যাখ্যা করা। ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের নির্বাচন এই পরিবর্তনশীলতার চারটি ভিন্ন পর্যায়ে দৃশ্যমান করে, যথা: প্রতিযোগিতাহীনতা, উচ্চমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা, বিকল্প প্রতিযোগিতার প্রদর্শন এবং সংস্কারনির্ভর পুনর্গঠিত প্রতিযোগিতা।

অতএব, অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশলের মূল বিশ্লেষণী প্রস্তাবনা হলো ক্ষমতা সংরক্ষণের নির্বাচনী কৌশল স্থির নয়। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, বিরোধী শক্তির ক্ষমতা, জনমত, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং বৈধতার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। এই ধারণার মাধ্যমে নির্বাচনী অনিয়মকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে নয়, এই ধারণাকে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামো, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বৈধতা নির্মাণের একটি রূপান্তরমূলক ইতিহাস। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে সামরিক শাসন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক দলকেন্দ্রিক নির্বাচনী কাঠামো এই প্রতিটি ধাপ বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচনকে বোঝার জন্য এই দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরকে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে নির্বাচনসমূহ মূলত প্রতিনিধি নির্বাচনের পাশাপাশি রাজনৈতিক বৈধতার উৎস হিসেবেও কাজ করেছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের নির্বাচন একদলীয় আধিপত্যের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেটি নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম ছিল (Jahan, 2005)। পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসনামলে নির্বাচন আরও স্পষ্টভাবে বৈধতা অর্জনের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ উভয়েই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের শাসনকে সাংবিধানিক ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। এই সময় নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হলেও কাঠামোগতভাবে অসম, যা পরবর্তীকালে ‘নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনব্যবস্থা’ এর ভিত্তি তৈরি করে (Riaz, 2016)। ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে বহুদলীয় প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। কিন্তু দলীয় অবিশ্বাস, প্রশাসনিক পক্ষপাত এবং নির্বাচনী সহিংসতার পুনরাবৃত্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে দেয়নি (Lewis, 2011)। ফলে নির্বাচন গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি ক্ষমতা-সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবেও টিকে থাকে। বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিক্রমা। ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু হয়, যার লক্ষ্য ছিল নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিত করা (Ahmed, 2004)। এই ব্যবস্থা ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে।

২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। সরকার যুক্তি দেয় যে, নির্বাচিত সরকারের অধীনেই নির্বাচন আয়োজন গণতান্ত্রিকভাবে অধিকতর বৈধ (Huq, 2012)। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এই পরিবর্তন নির্বাচনকালীন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে পুনরায় ক্ষমতাসীন সরকারের আওতায় নিয়ে আসে। এর ফলে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার নিরপেক্ষতা নিয়ে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়। এই পর্যায়ে থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্বাচনের বৈধতা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ক্রমে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। অর্থাৎ, বৈধতা আর পারস্পরিক আস্থা বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদিত হতে থাকে।

বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রকৌশলকে বিমূর্ত তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে এনে বাস্তব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বোঝার জন্য ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা জরুরি। এই চারটি নির্বাচন চারটি আলাদা রাজনৈতিক মুহূর্ত, এবং এই চারটি নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার রূপান্তরের চারটি ধাপ: বয়কট-নির্ভর নির্বাচন, উচ্চ-নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিকল্প প্রতিযোগিতার সিমুলেশন এবং সংস্কার-নির্ভর বৈধতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে প্রতিটি নির্বাচনকে নির্বাচনী প্রকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কীভাবে প্রতিযোগিতা সংগঠিত হয়েছে, কীভাবে বৈধতা নির্মিত হয়েছে, এবং কীভাবে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচনী ফলাফলের কাঠামো প্রভাবিত করেছে সেটা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই তুলনা একই বিশ্লেষণী মাত্রার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে: (ক) রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিসর ও প্রকৃতি, (খ) নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের ভূমিকা, (গ) তথ্য ও রাজনৈতিক বয়ানের ব্যবস্থাপনা, (ঘ) বিরোধী শক্তির ওপর চাপ বা অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা এবং (ঙ) নির্বাচনের বৈধতা নির্মাণের কৌশল। এই অভিন্ন মাত্রা ব্যবহারের ফলে চারটি নির্বাচনের মধ্যে কেবল কালানুক্রমিক পার্থক্য নয়, বরং নির্বাচনী প্রকৌশলের ধরন ও মাত্রার পরিবর্তনও তুলনামূলকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

- ২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) এবং তার জোট নির্বাচন বয়কট করে। এর ফলে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই প্রার্থীরা বিজয়ী হন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ১২৭টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনকে এমন এক নির্বাচনী অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ থাকলেও কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সুযোগ ছিল সীমিত। এছাড়া যে ১৪৭ টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ১০৫ টি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ১৪ টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৭ টি এবং অন্যান্য দল ১১ টি আসন লাভ করে (Bhattacharjee, 2014)। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রতিযোগিতার মৌলিক উপাদান ‘বিকল্প পছন্দ’ অনুপস্থিত ছিল। ফলে নির্বাচন একটি সাংবিধানিক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে টিকে থাকলেও গণতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্নে দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারি হিসাবে ভোটের উপস্থিতি ৪০-৪৬% বলা হলেও, রাজধানী ঢাকায় কিছু ক্ষেত্রে তা ২২% পর্যন্ত নেমে যায়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক-বিশেষত European Union, Commonwealth এবং United States বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং অনেকে পর্যবেক্ষক পাঠায়নি (Abedin, 2020)। ২০১৪ সালের নির্বাচন দেখায় যে নির্বাচনী প্রকৌশল সবসময় কারচুপি-নির্ভর নয়, কখনও এটি বিরোধী পক্ষকে এমন অবস্থায় ঠেলে দেয়, যেখানে তারা অংশগ্রহণ না করাকে একমাত্র কৌশল হিসেবে বেছে নেয়। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনও একটি নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ফলাফল তৈরি করতে সক্ষম হয়। এটি ছিল বর্জনমূলক প্রকৌশল যেখানে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত, কিন্তু সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই নির্বাচনী প্রকৌশলের প্রধান উপাদান ছিল প্রতিযোগিতার সরাসরি সংকোচন। এখানে নির্বাচন আয়োজন ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক বিকল্পের অনুপস্থিতি নির্বাচনের প্রতিনিষিদ্ধমূলক কার্যকারিতাকে সীমিত করে। এই কৌশলকে ‘বর্জনমূলক নির্বাচনী প্রকৌশল’ হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ হলো-এ ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ বা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রই সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচন দেখায় যে নির্বাচনী প্রকৌশলের জন্য সরাসরি ভোট কারচুপি অপরিহার্য নয়, প্রতিযোগিতার পূর্বশর্ত পরিবর্তন করেও নির্বাচনী ফলাফলের রাজনৈতিক কাঠামো প্রভাবিত করা সম্ভব।
- ২০১৮ সালের ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল এক ভিন্ন মডেল। এখানে বিরোধী জোট অংশগ্রহণ করে, ফলে বাহ্যিকভাবে এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের আগে ও নির্বাচন চলাকালে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা, গ্রেপ্তার, প্রচারণা বাধা এবং ভোট কারচুপির অভিযোগ ওঠে। আওয়ামীলীগ ২৫৮ টি আসনসহ রুলিং জোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে (Election Commission Bangladesh, 2018)। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিবেদনে অভিযোগ উঠে যে ভোটের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভর্তি করা হয়েছিল, যা বাংলাদেশি রাজনৈতিক অভিধানে ‘রাতের ভোট’ নামে পরিচিতি পায়। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে কিছু কেন্দ্রে ১০০% ভোট পড়েছে, আবার বহু কেন্দ্রে ৯০%-৯৯% উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে, যা পরিসংখ্যানগতভাবে অস্বাভাবিক (Riaz, 2021)। ২০১৮ সালের নির্বাচন ছিল সিমুলেটেড প্রতিযোগিতার উদাহরণ। এখানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখানো হয়, কিন্তু ফলাফলের কাঠামো পূর্বনির্ধারিত থাকে। এটি নির্বাচনী প্রকৌশলের আরও উন্নত রূপ, যেখানে: বিরোধী দল অংশ নেয়, ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়, ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে প্রতিযোগিতার বাস্তব কার্যকারিতা ক্ষীণ হয়ে যায়। এখানে বৈধতা নির্মাণের ভাষা ছিল-‘অংশগ্রহণ হয়েছে, তাই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য।’ কিন্তু অংশগ্রহণ মানেই কার্যকর প্রতিযোগিতা নয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২০১৪ সালের তুলনায় নির্বাচনী প্রকৌশলের পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে বিরোধী দলকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়নি, বরং তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বজায় রেখেও প্রতিযোগিতার কার্যকারিতা সীমিত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ২০১৪ সালের বর্জনমূলক নির্বাচনী কাঠামোর বিপরীতে ২০১৮ সালে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ বজায় থাকলেও সেই অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই পার্থক্যটি অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশলের ধারণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দেখায় যে রাজনৈতিক বৈধতার প্রয়োজন পরিবর্তিত হলে ক্ষমতাসীন পক্ষ প্রতিযোগিতাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ না দিয়ে তার দৃশ্যমানতা বজায় রেখেও প্রতিযোগিতার কার্যকর পরিসর সংকুচিত করতে পারে।
- ২০২৪ সালের ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আরেকটি ভিন্ন মডেল উপস্থাপন করে। প্রধান বিরোধী দল BNP নির্বাচন বর্জন করে। কিন্তু ২০১৪ সালের মতো সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের বদলে এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাধ্যমে

প্রতিযোগিতার একটি বিকল্প কাঠামো তৈরি করা হয়। এ নির্বাচনে বহু আসনে ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়ন না পাওয়া নেতারা স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ২২৪ টি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ১১ টি, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২ টি এবং অন্যান্য দল ৩ টি আসন লাভ করে (Election Commission Bangladesh, 2024)। এতে বাহ্যিকভাবে বহুপ্রার্থী নির্বাচন দেখা গেলেও, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা একই রাজনৈতিক বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয় যে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ছিল, এবং বিরোধী শক্তির অনুপস্থিতিতে নির্বাচনের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীলতা সীমিত ছিল। ২০২৪ সালের নির্বাচন ছিল নিয়ন্ত্রিত বহুত্ববাদের একটি উদাহরণ। এখানে প্রকল্পিত বিরোধী শক্তি অনুপস্থিত, কিন্তু বিকল্প প্রার্থীদের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার চিত্র নির্মাণ করা হয়। এটি নির্বাচনী প্রকৌশলের আরও সূক্ষ্ম ধাপ, যেখানে: বৈচিত্র্যের ধারণা তৈরি হয়, নির্বাচনের একঘেয়েমি কমানো হয়, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রতিযোগিতার দৃশ্যমানতা বজায় রাখা হয় কিন্তু কাঠামোগতভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য অপরিবর্তিত থাকে। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাংলাদেশ সরকার নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক বলে দাবি করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে জনগণ তাদের রায় দিয়েছে এবং এই নির্বাচন দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। অন্যদিকে, বিএনপি ও তাদের সমমনা বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে। তাদের দাবি ছিল, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আরও অভিযোগ করে যে ভোটার উপস্থিতি কম ছিল এবং নির্বাচন জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নির্বাচন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ভারত, চীন ও রাশিয়া শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান প্রকাশ করে (Global Issues, 2024)। বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায় যে নির্বাচনটি ‘free and fair’ ছিল না এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ অংশগ্রহণের অভাব নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে। একইভাবে যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিবেশ আরও উন্নত করার আহ্বান জানায় (Al-Jazieera, 2024)। ভোটার উপস্থিতি নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত চূড়ান্ত ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৪১.৮ শতাংশ, তবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যবেক্ষক এবং সংবাদমাধ্যম এই হার নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং অনেক কেন্দ্রে তুলনামূলক কম ভোটার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে। সার্বিকভাবে, ২০২৪ সালের নির্বাচন সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও এর অংশগ্রহণমূলক চরিত্র, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা, ভোটার উপস্থিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। ২০২৪ সালের নির্বাচন তাই ২০১৪ ও ২০১৮-এর তুলনায় নির্বাচনী প্রকৌশলের আরও সূক্ষ্ম একটি রূপ নির্দেশ করে। এখানে প্রতিযোগিতাকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ বা কেবল নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার দৃশ্যমানতা বজায় রাখার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিরোধী শক্তির অনুপস্থিতির মধ্যেও বহু প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থিতার উপস্থিতি নির্বাচনী বহুত্বের একটি দৃশ্যমান কাঠামো তৈরি করে। এই কারণে ২০২৪ সালের নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত বহুত্ববাদ হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায়-যেখানে বহুত্ববাদের দৃশ্যমানতা বিদ্যমান থাকলেও ক্ষমতার কাঠামোগত ভারসাম্য অপরিবর্তিত থাকার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

➤ ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে একটি গুণগত বিচ্ছেদ হিসেবে বিবেচ্য। এটি জুলাই-২০২৪ পরবর্তী রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক পরীক্ষা। দীর্ঘ সময়ের বিতর্কিত নির্বাচনী অভিজ্ঞতার পর ২০২৬ সালের নির্বাচনকে ঘিরে প্রধান প্রশ্ন ছিল-বাংলাদেশ কি সত্যিই একটি প্রতিযোগিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থায় ফিরতে পারবে? উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, এবং একই দিনে একটি সাংবিধানিক গণভোটও আয়োজন করা হয় (AP News, 2026)। এই যুগপৎ আয়োজন নিজেই একটি নতুন রাজনৈতিক বিন্যাস নির্দেশ করে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানটি সরকার গঠনের পাশাপাশি রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্নির্মাণের ম্যাডেট অর্জনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনকে পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনের সরল বিপরীত হিসেবে দেখা হলে নির্বাচনী প্রকৌশলের ধারণাটি অতিরিক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। বরং এই নির্বাচন দেখায় যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নির্বাচনী প্রকৌশলের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং বৈধতার ভাষা পরিবর্তিত হতে পারে। পূর্ববর্তী পর্যায়ে যেখানে প্রতিযোগিতা সংকুচিত বা নিয়ন্ত্রিত করার কৌশল অধিক দৃশ্যমান ছিল, সেখানে ২০২৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন, নির্বাচনী নিরপেক্ষতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সাংবিধানিক সংস্কারের সঙ্গে নির্বাচনী বৈধতাকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা সামনে আসে।

অতএব, এখানে নির্বাচনী প্রকৌশল বিলুপ্ত হয়েছে-এমনটি নয়, বরং এর নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

➤ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২১০টি সরাসরি নির্বাচিত আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে অবস্থান নেয়। ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (NCP) ৬টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৭টি আসন লাভ করেন। অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২টি এবং গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস ও গণসংহতি আন্দোলন প্রত্যেকে ১টি করে আসন লাভ করে (Election Commission Bangladesh, 2026)। এই ফলাফল ২০২৪ সালের নির্বাচনের তুলনায় বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রতিযোগিতার কাঠামোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। ২০২৬ সালে ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী শক্তির বিন্যাস, রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বের ধরন পূর্ববর্তী নির্বাচনের তুলনায় ভিন্ন বিন্যাস তৈরি করে। বিশেষত, বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভাব একটি পুনর্বিন্যস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তী বিশ্লেষণের মূল প্রশ্ন হলো এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক বিন্যাস এর সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান, প্রতিযোগিতার কাঠামো এবং বৈধতা নির্মাণের কৌশল কীভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে।

২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরবর্তী একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন হিসেবে দেখা যায়। নির্বাচনটি একটি অন্তর্বর্তী প্রশাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক সংস্কার-সংক্রান্ত গণভোটও অনুষ্ঠিত হয়, যা বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে একটি নতুন রাজনৈতিক পর্বের সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (IFES, 2026; Election Commission Bangladesh, 2026)। এই অন্তর্বর্তী প্রশাসনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল-নির্বাচনী ও সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন। যদিও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নানা জটিলতার কারণে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তবে পূর্ববর্তী নির্বাচনের বিপরীতে এখানে মূল রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল নির্বাচন-ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, এবং প্রতিযোগিতার প্রকৃত সুযোগ। ২০২৬ নির্বাচনের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন। IFES এর নির্বাচনী বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করলে আইনি ও প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয়, যার মধ্যে অন্তর্বর্তী শাসনব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল প্রচারণা নিয়ন্ত্রণ, এবং পুনঃভোটের বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো বিলোপের পর নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষতার প্রশ্ন দীর্ঘদিন বিতর্কিত ছিল। ২০২৬ এ সেই শূন্যতা আংশিকভাবে পূরণিত হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার মানেই গণতান্ত্রিক নিশ্চয়তা নয়। প্রতিষ্ঠান কার্যকর হতে হলে রাজনৈতিক অভিনেতাদের আচরণও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মানচিত্র আগের তুলনায় ভিন্ন ছিল। ঐতিহ্যগত দ্বিমেরু রাজনীতির পাশাপাশি নতুন শক্তি হিসেবে NCP এবং বিভিন্ন জোট সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এটি নির্বাচনী বহুমাত্রিকতা নির্দেশ করে। কিন্তু একইসঙ্গে আরেকটি জটিল বাস্তবতা ছিল পূর্ববর্তী শাসকদল আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ বা কার্যত বহিস্কৃত অবস্থান। কিছু আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে এটিকে রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস হিসেবে দেখা হলেও, অন্যদিকে এটি প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অর্থাৎ, নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হলেও তা সর্বাংশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল কি না-এ প্রশ্ন উন্মুক্ত। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও সাংবিধানিক গণভোট আয়োজন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে নির্বাচনী বৈধতাকে নীতিগত বৈধতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এটি একধরনের দ্বৈত-বৈধতানির্মাণের কৌশল: সংসদীয় ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের বৈধতা অর্জন এবং গণভোটের মাধ্যমে সাংবিধানিক পরিবর্তনের বৈধতা অর্জন। তবে গণভোট ফলাফলে কিছু পরিসংখ্যানগত অসঙ্গতির অভিযোগও উঠে, যেমন কিছু এলাকায় ভোটের সংখ্যার চেয়ে বেশি ভোট গণনা। এসব তথ্য নির্বাচন-পরবর্তী বিতর্কে জিইয়ে রাখে। সংস্কারমুখী নির্বাচন যদি তথ্যগত স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তবে বৈধতার সংকট তৈরি হয়। ২০২৬ সালের নির্বাচন পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর তুলনায় বেশি প্রতিযোগিতামূলক ও সংস্কারমুখী হলেও, এটি সম্পূর্ণভাবে ‘প্রকৌশল-মুক্ত’ ছিল এ দাবি করা কঠিন। বরং এটি সংস্কারনির্ভর নির্বাচনী প্রকৌশলের একটি নতুন ধরন: প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার পুনর্গঠন, বৈধতা অর্জনে গণভোট সংযোজন, নতুন দলীয় বিন্যাসের সুযোগ কিন্তু আংশিক বর্জন ও বিতর্কিত প্রশাসনিক উপাদান। অর্থাৎ, প্রকৌশল অদৃশ্য হয়নি, তার ধরন বদলেছে। ২০২৬ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় পুনরারম্ভ, কিন্তু চূড়ান্ত গন্তব্য নয়। এটি দেখিয়েছে যে রাজনৈতিক রূপান্তরের পরও নির্বাচন একটি ক্ষমতার প্রযুক্তি হিসেবেই কাজ করতে পারে, শুধুমাত্র তার ভাষা ও রূপ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ২০২৬ সালের নির্বাচনকে

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সুসংহতকরণের প্রমাণ হিসেবে না দেখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিন্যাস হিসেবে দেখা অধিক যুক্তিসঙ্গত। নির্বাচনী প্রতিযোগিতার বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করলেও, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা এবং নির্বাচনের পরবর্তী জবাবদিহির প্রশ্নগুলো এখনো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রয়ে যায়।

- এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে নির্বাচনী প্রকৌশল সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক তাৎপর্য উদ্ভূত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা সবসময় সরাসরি বিলুপ্ত করা হয়নি; বরং রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিরোধী শক্তির সক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ এবং বৈধতার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতার পরিসর ও ধরন পুনর্গঠিত হয়েছে। এই প্রবণতা প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদের অসম প্রতিযোগিতার ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কেবল একটি স্থিতি ও শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাস দিয়ে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ ও ২০২৬ সালের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়। একইভাবে, নির্বাচনকে কেবল ক্ষমতা ধরে রাখার উপায় হিসেবে দেখলেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পরিবর্তিত বৈধতা-নির্মাণের কৌশলগুলো সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না। বরং চারটি নির্বাচনের তুলনা দেখায় যে নির্বাচনী প্রকৌশল একটি পরিবর্তনশীল ও অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া যেখানে কখনো প্রতিযোগিতা সংকুচিত করা, কখনো নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা বজায় রাখা, কখনো প্রতিযোগিতার দৃশ্যমানতা তৈরি করা এবং কখনো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নতুন বৈধতা নির্মাণ করা হতে পারে। এই পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই গবেষণায় ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণাটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ধারণাটির মূল বক্তব্য হলো, ক্ষমতা ও বৈধতার রাজনৈতিক প্রয়োজন অপরিবর্তিত থাকলেও তা অর্জনের নির্বাচনী কৌশল অপরিবর্তিত থাকে না, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার কাঠামো, অংশগ্রহণের সুযোগ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং বৈধতা নির্মাণের পদ্ধতিও পুনর্গঠিত হতে পারে।

উপসংহার

এই গবেষণা বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে নির্বাচনী প্রকৌশলের পরিবর্তনশীল রূপ এবং এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছে। ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি দেখিয়েছে যে নির্বাচনী প্রকৌশলকে কেবল নির্বাচনী অনিয়ম, ভোট কারচুপি বা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সমষ্টি হিসেবে বোঝা যথেষ্ট নয়। বরং এটি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিসর নির্ধারণ, অংশগ্রহণের সুযোগ পুনর্বিন্যাস, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচনের বৈধতা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। চারটি নির্বাচনের তুলনা থেকে দেখা যায়, এই প্রক্রিয়ার ধরন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রতিযোগিতা সংকোচন, ২০১৮ সালে নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা, ২০২৪ সালে নিয়ন্ত্রিত বহুত্ববাদ এবং ২০২৬ সালে অধিক বহুমুখী প্রতিযোগিতার পুনর্গঠন এই ধারাবাহিকতা নির্বাচনী প্রকৌশলের একটি অভিযোজনশীল চরিত্র নির্দেশ করে।

এই গবেষণার প্রধান তাত্ত্বিক অবদান হলো ‘অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল’ ধারণার প্রস্তাবনা। প্রচলিত নির্বাচনী প্রকৌশলের আলোচনায় নির্বাচনী কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানকে প্রায়ই ক্ষমতা সংরক্ষণ বা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের তুলনামূলকভাবে স্থির কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা বরং দেখায় যে নির্বাচনী প্রকৌশলের কৌশল রাজনৈতিক চাপ, বিরোধী শক্তির সক্ষমতা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এবং বৈধতার প্রয়োজনের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ, ক্ষমতা সংরক্ষণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও তা অর্জনের নির্বাচনী পদ্ধতি স্থির থাকে না। কখনো প্রতিযোগিতা সংকুচিত করা, কখনো নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা বজায় রাখা, কখনো প্রতিযোগিতার দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করা এবং কখনো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নতুন বৈধতা নির্মাণ-এসব ভিন্ন কৌশল একই বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভিযোজিত রূপ হতে পারে।

এই ফলাফল প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদের ধারণার সঙ্গেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নির্দেশ করে। বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে অসম প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ক্ষমতার রাজনৈতিক ব্যবহার এবং বিরোধী শক্তির সীমিত পরিসর এই ধারণার কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে চারটি নির্বাচনের তুলনা একই শাসনব্যবস্থাগত পরিচিতি দিয়ে পুরো সময়পর্বকে ব্যাখ্যা করার সীমাবদ্ধতাও তুলে ধরে। রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হলে প্রতিযোগিতার ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি স্থির শাসনব্যবস্থাগত শ্রেণিবিন্যাসের পাশাপাশি

প্রক্রিয়াভিত্তিক বিশ্লেষণও প্রয়োজন, যা নির্বাচনী প্রতিযোগিতা কীভাবে পুনর্গঠিত হয় এবং বৈধতার কৌশল কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা অনুসরণ করতে পারে।

২০২৬ সালের নির্বাচন এই ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করলেও এটিকে গণতান্ত্রিক সুসংহতকরণের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হবে না। বরং এটি এমন একটি অন্তর্বর্তকালীন বিন্যাস নির্দেশ করে যেখানে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার বিস্তার, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং নতুন রাজনৈতিক বৈধতার অনুসন্ধান একই সঙ্গে কার্যকর হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনী গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে কেবল প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন আয়োজনের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দলের সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নির্বাচনী ফলাফলের প্রতি রাজনৈতিক আস্থার ওপর।

সুতরাং বাংলাদেশের নির্বাচনী গণতন্ত্রকে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থিতিশীল করতে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানভিত্তিক নিরপেক্ষতা, রাজনৈতিক সমান সুযোগ, স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রশাসন এবং কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নির্বাচনের বৈধতাকে কেবল সাংবিধানিক বা প্রক্রিয়াগত বৈধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জনগণের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিযোগিতার বাস্তব সমতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচন আয়োজনের বিষয় নয়, বরং কে প্রতিযোগিতা করতে পারে, কীভাবে প্রতিযোগিতা করে এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের সম্মতি রাজনৈতিক বৈধতায় রূপান্তরিত হয় এই তিনটি প্রশ্নের প্রাতিষ্ঠানিক সমাধানের বিষয়।

লেখকের অবদান

এই গবেষণার মূল ধারণা, গবেষণা সমস্যার নির্ধারণ এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণী কাঠামো প্রণয়নে ড. মোঃ আল-আমীন হুসাইন প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তি নির্মাণ, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ফলাফলের বিশ্লেষণেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জাহিদ হাসান শেখ গবেষণার তথ্য উপস্থাপন, আলোচনার বিস্তার এবং ফলাফলকে সুসংগঠিত করতে সহায়তা করেছেন। প্রবন্ধের খসড়া প্রস্তুত ও সম্পাদনায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে উভয় লেখক সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রবন্ধ প্রস্তুত করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি লেখকদ্বয় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। গবেষণার ধারণা পরিমার্জন, প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ অনুসন্ধান এবং একাডেমিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

লেখকদ্বয় ঘোষণা করেছেন যে এই গবেষণা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ বা ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে-এমন কোনো আর্থিক, পেশাগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব তাঁদের নেই।

তথ্যসূত্র

1. Abedin J. (2020) Legitimacy Crisis in Bangladesh: A Case Study of 10th General Election, European Journal of Social Sciences Studies, Volume: 3, Issue: 2, 2020
2. Ahmed, N. (2004). Bangladesh: Reform agenda for local governance. University Press Limited.
3. Ali, A. (2018). Electoral politics in Bangladesh: Challenges and prospects. Dhaka: University Press Limited.
8. Al-Jazeera (2024) Sheikh Hasina wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout-controversy?>

৫. AP News (2026), Bangladesh Nationalist Party claims victory in country's first election since 2024 uprising, <https://apnews.com/article/bangladesh-election-hasina-tarique-rahman-bnp-8ec3a74b4488dfe998b3d1d232c3ba4f>
৬. Bangladesh Election Commission. (2014). Tenth National Parliament Election: Election results. Election Commission Secretariat, Dhaka, Bangladesh.
৭. Bangladesh Election Commission. (2018). Eleventh National Parliament Election: Election results. Election Commission Secretariat, Dhaka, Bangladesh.
৮. Bangladesh Election Commission. (2024). Twelfth National Parliament Election: Election results. Election Commission Secretariat, Dhaka, Bangladesh.
৯. Bangladesh Election Commission. (2026). Thirteenth National Parliament Election: Election results. Election Commission Secretariat, Dhaka, Bangladesh.
১০. Bhattacharjee, J. (2014), Bangladesh: Election-2014, an Assessment, <https://www.orfonline.org/research/bangladesh-election-2014-an-assessment/>
১১. Beetham, D. (1991). The legitimation of power. Macmillan.
১২. Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.
১৩. Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147–162.
১৪. European Union Election Observation Mission. (2009). Final report on the parliamentary elections in Bangladesh 2008. European Union.
১৫. Freedom House. (2024). Freedom in the world 2024: Bangladesh. Freedom House.
১৬. Gandhi, J., & Lust-Okar, E. (2009). Elections under authoritarianism. *Annual Review of Political Science*, 12, 403–422.
১৭. Global Issues (2024), Bangladesh: Election with a Foregone Conclusion, <https://www.globalissues.org/news/2024/01/12/35740>
১৮. Hartlyn, J., McCoy, J., & Mustillo, T. (2008). Electoral governance matters: Explaining the quality of elections in contemporary Latin America. *Comparative Political Studies*, 41(1), 73–98.
১৯. Human Rights Watch. (2019). World report 2019: Bangladesh events of 2018. Human Rights Watch.
২০. Huq, S. (2012). Constitutional change and democratic transition in Bangladesh. *Contemporary South Asia*, 20(3), 345–360.
২১. International Foundation for Electoral Systems. (2026). Bangladesh 2026 parliamentary elections and national referendum: Election snapshot. IFES.

২২. Jahan, R. (2005). Bangladesh politics: Problems and issues. University Press Limited.
২৩. Le Monde. (2026, February 13). Bangladesh ends its authoritarian chapter as BNP wins parliamentary majority. Le Monde.
২৪. Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.
২৫. Lewis, D. (2011). Bangladesh: Politics, economy and civil society. Cambridge University Press.
২৬. Mitra, D. (2026, February). Bangladesh election 2026 explained: Who's competing, what's at stake, and why it matters. The Wire.
২৭. O'Donnell, G. (1994). Delegative democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55-69.
২৮. Reuters. (2026, February 10). Main issues in Bangladesh's February 12 election. Reuters.
২৯. Riaz, A. (2016). Bangladesh's political trajectory: Democracy and Authoritarianism. *Asian Affairs*, 47(3), 1-20.
৩০. Riaz, Ali (21 September 2020). 'The pathway of democratic backsliding in Bangladesh'. *Democratization*. Taylor & Francis, 28: 179-197.
৩১. Riaz, A. (2022). Voting in a hybrid regime: Explaining the 2018 Bangladeshi election. Routledge.
৩২. Riaz, A., & Fair, C. C. (2016). Political Islam and governance in Bangladesh. Routledge.
৩৩. Schedler, A. (2002). The menu of manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36-50.
৩৪. Schedler, A. (2006). Electoral authoritarianism: The dynamics of unfree competition. Lynne Rienner Publishers.
৩৫. Shahid, R. (2026, February 6). Why Bangladesh's elections will echo far beyond its borders. Atlantic Council.
৩৬. The Carter Center. (2014). Election review in Bangladesh: Observational findings and democratic concerns. The Carter Center.
৩৭. The Daily Star. (2026, February 12). Election on February 12. The Daily Star.
৩৮. Transparency International Bangladesh. (2019). Assessment of electoral integrity in Bangladesh. TIB.
৩৯. University of Essex Human Rights Centre. (2019). Democracy and elections in South Asia: Bangladesh case review. University of Essex.